আন নাবা

৭৮

নামকরণ

দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ বাক্যাংশের 'আন্ নাবা' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এটি কেবল নামই নয়, এই সূরার সমগ্র বিষয়বস্তুর শিরোনামও এটিই। কারণ নাবা মানে হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাতের খবর। আর এই সূরায় এরি ওপর সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় আগেই বলে এসেছি, সূরা আল কিয়ামাহ থেকে আন্ নাযিআ'ত পর্যন্ত সবক'টি সূরার বিষয়বস্তুর পরস্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুআয্যমার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরা আল মুরসালাতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই একই বিষয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও কিয়ামত ও আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ এবং তা মানা ও না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে মক্কা মুআয্যমায় তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এক, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করা যাবে না। দুই, তাঁকে আল্লাহ নিজের রসূলের পদে নিযুক্ত করেছেন। তিন, এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর শুরু হবে আর এক নতুন জগতের। সেখানে আগের ও পরের সব লোকদের আবার জীবিত করা হবে। দুনিয়ায় যে দৈহিক কাঠামো ধারণ করে তারা কাজ করেছিল সেই কাঠামো সহকারে তাদের উঠানো হবে। তারপর তাদের বিশ্বাস ও কাজের হিসেব নেয়া হবে। এই হিসেব নিকেশের ভিত্তিতে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে প্রথমটি আরবদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব এবং স্রষ্টা ও রিজিকদাতা বলেও মানতো। অন্য যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ

ও মাবুদ গণ্য করতো তাদের সবাইকে আল্লাহরই সৃষ্টি বলেও স্বীকার করতো। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতায় এবং তাঁর ইলাহ হবার মূল সত্তায় তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি নেই এটিই ছিল মূল বিরোধীয় বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি মক্কার লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তবে নবুওয়াতের দাবী করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে চল্লিশ বছরের যে জীবন যাপন করেছিলেন সেখানে তারা কখনো তাঁকে মিথ্যুক, প্রতারক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে পায়নি। এ বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাদের ছিল না। তারা নিজেরাই তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, শান্ত প্রকৃতি, সুস্থমতি ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই হাজার বাহানাবাজী ও অভিযোগ–দোষারোপ সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ব্যাপারেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবীর ব্যাপারে নাউযুবিল্লাহ তিনি ছিলেন মিথ্যুক, এ বিষয়টি অন্যদের বুঝানো তো দূরের কথা তাদের নিজেদের পক্ষেও মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল।

এভাবে প্রথম দু'টি বিষয়ের তুলনায় তৃতীয় বিষয়টি মেনে নেয়া ছিল মক্কাবাসীদের জন্য অনেক বেশী কঠিন। এ বিষয়টি তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা এর সাথে সবচেয়ে বেশী বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করলো। এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশী বিস্ময় প্রকাশ করলো। একে তারা সবচেয়ে বেশী অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করে যেখানে সেখানে একথা ছড়াতে লাগলো যে তা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসকে তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া অপরিহার্য ছিল। কারণ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হলে হক ও বাতিলের ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারতো না, ভালো–মন্দ ও ন্যায়–অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মূল্যমানে পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে তাদের পক্ষে ইসলাম প্রদর্শিত পথে এক পা চলাও সম্ভব হতো না। এ কারণে মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে আখেরাত বিশ্বাসকে মনের মধ্যে মজবুতভাবে বদ্ধমূল করে দেয়ার ওপরই বেশী জোর দেয়া হয়েছে। তবে এ জন্য এমনসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার ফলে তাওহীদের ধারণা আপনা আপনি হৃদয়গ্রাহী হতে চলেছে। মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ যুগের সূরাগুলোতে আখেরাতের আলোচনা বারবার আসার কারণ ভালোভাবে অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যাক। কিয়ামতের খবর শুনে মক্কার পথেঘাটে অলিগলিতে সর্বত্র এবং মক্কাবাসীদের প্রত্যেকটি মাহফিলে যেসব আলোচনা, সমালোচানা, মন্তব্য ইত্যাদি শুরু হয়েছিল এখানে সবার আগে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের জন্য যে জমিকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? জমির মধ্যে আমি এই যে উঁচু উঁচু বিশাল বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী গেঁড়ে রেখেছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? তোমরা কি নিজেদের দিকেও তাকাও না, কিভাবে আমি তোমাদের নারী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি? তোমরা নিজেদের নিদ্রাকে

দেখো না, যার মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তোমাদেরকে কাজের যোগ্য করে রাখার জন্য আমি তোমাদের কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমের পর আবার কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছি? তোমরা কি রাত ও দিনের আসা–যাওয়া দেখছো না, তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে যথারীতি ধারাবাহিকভাবে জারী রাখা হয়েছে? তোমরা কি নিজেদের মাথার উপর মজবুতভাবে সংঘবদ্ধ আকাশ ব্যবস্থাপনা দেখছো না? তোমরা কি এই সূর্য দেখছো না, যার বদৌলতে তোমরা আলো উত্তাপ লাভ করছো? তোমরা কি বৃষ্টিধারা দেখছো না, যা মেঘমালা থেকে বর্ষিত হচ্ছে এবং যার সাহায্যে ফসল, শাক–সব্জি সবুজ বাগান ও ঘন বন–জংগল সৃষ্টি হচ্ছে? এসব জিনিস কি তোমাদের একথাই জানাচ্ছে যে, যে মহান অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠান ও আখেরাত সৃষ্টি করতে অক্ষম? এই সমগ্র কারখানাটিতে যে পরিপূর্ণ কলাকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট স্ফূরণ দেখা যায়, তা প্রত্যক্ষ করার পর কি তোমরা একথাই অনুধাবন করছো যে, সৃষ্টিলোকের এই কারখানার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি কর্ম একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হচ্ছে কিন্তু মূলত এই কারখানাটি নিজেই উদ্দেশ্যবিহীন? এ কারখানায় মানুষকে মুখপাত্রের (Foreman) দায়িত্বে নিযুক্ত করে তাকে এখানে বিরাট ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কিন্তু যখন সে নিজের কাজ শেষ করে কারখানা ত্যাগ করে চলে যাবে তখন তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, ভালোভাবে কাজ করার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে না ও পেনশন দেয়া হবে না এবং কাজ নষ্ট ও খারাপ করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং শাস্তি দেয়া হবে না; এর চাইতে অর্থহীন ও বাজে কথা মনে হয় আর কিছুই হতে পারে না। এ যুক্তি পেশ করার পর পূর্ণ শক্তিতে বলা হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বিচারের দিন তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যি আসবে। শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেবার সাথে সাথেই তোমাদের যেসব বিষয়ের খবর দেয়া হচ্ছে তা সবই সামনে এসে যাবে। তোমরা আজ তা স্বীকার করো বা না করো, সে সময় তোমরা যে যেখানে মরে থাকবে সেখান থেকে নিজেদের হিসেব দেবার জন্য দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের অস্বীকৃতি সে ঘটনা অনুষ্ঠানের পথ রোধ করতে পারবে না।

এরপর ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা হিসেব–নিকেশের আশা করে না এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ গুণে গুণে আমার এখানে লিখিত হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য জাহান্নাম ওঁৎপেতে বসে আছে। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডের পুরোপুরি বদলা তাদেরকে চুকিয়ে দেয়া হবে। তারা ৩১ থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতে এমন সব লোকের সর্বোত্তম প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও আল্লাহর কাছে নিজেদের সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে মনে করে সবার আগে দুনিয়ার জীবনে নিজেদের আখেরাতের কাজ করার কথা চিন্তা করেছে। তাদের এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের কার্যাবলীর কেবল প্রতিদানই দেয়া হবে না, বরং তার চাইতে যথেষ্ট বশী পুরস্কারও দেয়া হবে।

সবশেষে আল্লহার আদালতের চিত্র আঁকা হয়েছে। সেখানে কারোর নিজের জিদ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে যাওয়া এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মাফ করিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অনুমতি ছাড়া কেউ কথাই বলতে পারবে না। আর অনুমতি হবে এ শর্ত সাপেক্ষে যে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র তার জন্য সুপারিশ

করা যাবে এবং সুপারিশে কোন অসংগত কথাও বলা যাবে না। তাছাড়া একমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় সত্যের কালেমার প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং নিছক গুনাহগার আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন কোন সত্য অস্বীকারকারী কোন প্রকার সুপারিশ লাভের হকদার হবে না।

তারপর এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দিনের আগমনী সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। তাকে দূরে মনে করো না। সে কাছেই এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা সেদিনটির কথা মেনে নিয়ে নিজের রবের পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে একদিন সমস্ত কর্মকাণ্ড তার সামনে এসে যাবে। তখন সে কেবল অনুতাপই করতে পারবে। সে আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! যদি দুনিয়ায় আমার জন্মই না হতো। আজ যে দুনিয়ার প্রেমে সে পাগলপারা সেদিন সেই দুনিয়ার জন্যই তার মনে এ অনুভূতি জাগবে।

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝١ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ۝٢ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٥ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝٦ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝٧ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١

এরা কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই বড় খবরটা সম্পর্কে কি, যে ব্যাপারে এরা নানান ধরনের কথা বলে ও ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে ফিরছে?[১] কখ্‌খনো না,[২] শীঘ্রই এরা জানতে পারবে। হাঁ কখ্‌খনো না, শীঘ্রই এরা জানতে পারবে।[৩]

একথা কি সত্য নয়, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি?[৪] পাহাড়গুলোকে গেঁড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো?[৫] তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি?[৬] তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন,[৭] রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়?[৮]

১. বড় খবর বলতে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা অবাক হয়ে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শুনতো। তারপর তাদের প্রত্যেকটি আলাপ–আলোচনায়, বৈঠকে, মজলিসে এ সম্পর্কে নানান ধরনের কথা বলতো ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। জিজ্ঞাসাবাদ বলতেও এ নানা ধরনের কথাবার্তা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপের কথাই বোঝানো হয়েছে। লোকেরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে বলতো, আরে ভাই, শুনেছো নাকি? মানুষ নাকি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হবে? এমন কথা আগে কখনো শুনেছিলে? যে মানুষটি মরে পচে গেছে, যার শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত মাটিতে মিশে গেছে, তার মধ্যে নাকি আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হবে, একথা কি মেনে নেয়া যায়? আগের পরের সব বংশধররা জেগে উঠে এক জায়গায় জমা হবে, একথা কি যুক্তিসম্মত? আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে পৃথিবী পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা এসব বড় বড় পাহাড় নাকি পেঁজা তুলোর মতো বাতাসে উড়তে থাকবে? চাঁদ, সুরুজ আর তারাদের আলো কি নিভে যেতে পারে? দুনিয়ার এই জমজমাট ব্যবস্থাটা কি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে? এই

মানুষটি তো গতকাল পর্যন্তও বেশ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল, আজ তার কি হয়ে গেলো, আমাদের এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর শুনিয়ে যাচ্ছে? এ জান্নাত ও জাহান্নাম এতদিন কোথায় ছিল? এর আগে কখনো আমরা তার মুখে একথা শুনিনি কেন? এখন এরা হঠাৎ টপকে পড়লো কোথা থেকে? কোথা থেকে এদের অদ্ভুত ধরনের ছবি এঁকে এনে আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে?

هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ আয়াতাংশটির একটি অর্থ তো হচ্ছে ঃ "এ ব্যাপারে তারা নানান ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে।" এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আকীদা পোষণ করে না বরং "তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।" তাদের কেউ কেউ খৃষ্টানদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তারা মৃত্যুর পরের জীবন স্বীকার করতো। তবে এই সংগে তারা একথাও মনে করতো যে, এই জীবনটি শারীরিক নয়, আত্মিক পর্যায়ের হবে। কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্বীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ "আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।" [আল জাসিয়াহ, ৩১] আবার কেউ কেউ একদম পরিষ্কার বলতো ঃ اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ "আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটিই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না।" [আল আন'আম, ২৯] তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সবকিছুর জন্য সময়কে দায়ী করতো। তারা বলতোঃ مَاهِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ "আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটিই সব কিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই জীবন লাভ করি এবং সময়ের চক্র ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধ্বংস করে।" [আল জাসিয়া, ২৪] আবার এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সময়কে সবকিছুর জন্য দায়ী না করলেও মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করতো। অর্থাৎ তাদের মতে, মরা মানুষদের আবার জীবিত করে তোলার ক্ষমতা আল্লাহর ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল ঃ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ "এই হাড়গুলো পঁচেগলে নষ্ট হয়ে যাবার পর আবার এগুলোকে জীবিত করবে কে?" [ইয়াসীন, ৭৮] তাদের এসব বিভিন্ন বক্তব্য একথা প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান ছিল না। বরং তারা নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। নয়তো এ ব্যাপারে তাদের কাছে যদি কোন সঠিক জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা সবাই একটি বক্তব্যের উপর একমত হতে পারতো (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আয্ যারিয়াতের ৬ টীকা দেখুন)।

২. অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনক্রমেই সঠিক নয়।

৩. অর্থাৎ যে বিষয়ে এরা নিজেরা নানা আজেবাজে কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে সেটি যথার্থ সত্য হয়ে এদের সামনে ফুটে ওঠার সময় মোটেই দূরে নয়। সে সময় এরা জানতে পারবে, রসূল এদেরকে যে খবর দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক এবং আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এরা যেসব কথা তৈরী করছিল তা ছিল ভিত্তিহীন অসার।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝١٣ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝١٦
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝١٧ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝١٨
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝١٩ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠

তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি[৯] এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত বাতি সৃষ্টি করেছি?[১০] আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা, যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি শস্য, শাক সব্জি ও নিবিড় বাগান?[১১]

নিসন্দেহে বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়েই আছে। যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।[১২] আকাশ খুলে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজায় পরিণত হবে। আর পর্বতমালাকে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।[১৩]

৪. যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ একটি শান্তিময় আবাস ভূমিতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের স্থানগুলো দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, আন নাম্‌ল ৭৩, ৭৪ ও ৮১ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ৯০ ও ৯১ টীকা, আয্‌ যুখ্‌রুফ ৭ টীকা, আল জাসিয়াহ ৭ টীকা এবং কাফ ১৮ টীকা।

৫. পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টির কারণ এবং এর পেছনে আল্লাহর যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে তা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাহল ১২ টীকা, আন নম্‌ল ৭৪ টীকা এবং আল মুরসালাত ১৫ টীকা দেখুন।

৬. মানব জাতিকে নারী ও পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার যে মহান কল্যাণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল ফুরকান ৬৯ টীকা, আর রুম ২৮ থেকে ৩০ টীকা, ইয়াসীন ৩১ টীকা, আশ্‌ শূরা ৭৭ টীকা, আয্‌ যুখরুফ ১২ টীকা এবং আল কিয়ামাহ ২৫ টীকা দেখুন।

৭. মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক অভিলাষ বা চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর এই চাহিদা আবার তাকে কয়েক ঘন্টা ঘুমাতে বাধ্য করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা আর রুম ৩৩ টীকা।

৮. অর্থাৎ রাতকে অন্ধকার করে দিয়েছি। ফলে আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে তোমরা সহজেই ঘুমের প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দিনকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছি। ফলে তার মধ্যে তোমরা অতি সহজেই নিজেদের রুজি–রোজগারের জন্য কাজ করতে পারবে। পৃথিবীতে রাত–দিনের নিয়মিত ও নিরবছিন্ন আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তার মধ্য থেকে মাত্র এই একটি কল্যাণের দিকে ইংগিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ একথা বুঝাতে চান যে, এখানে যা কিছু ঘটছে এগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে বা ঘটনাক্রমে ঘটছে না। বরং এর পেছনে একটি মহান কল্যাণকর উদ্দেশ্য কাজ করছে। তোমাদের নিজেদের স্বার্থের সাথে এ উদ্দেশ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তোমাদের অস্তিত্বের গঠন প্রকৃতি নিজের আরাম ও প্রশান্তির জন্য যে অন্ধকারের অভিলাষী ছিল তার জন্যে রাতকে এবং তার জীবিকার জন্য যে আলোর অভিলাষী ছিল তার জন্য দিনকে সরবরাহ করা হয়েছে। তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদিত এই ব্যবস্থাপনা নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে চলছে যে, কোন জ্ঞানময় সত্তার কর্মকৌশল ছাড়া এটা সম্ভবপর হয়নি। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৬৫ টীকা, ইয়াসীন ৩২ টীকা, আল মু'মিন ৮৫ টীকা এবং আয্ যুখ্রুফ ৪ টীকা)।

৯. মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশের সীমান্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না। এ সীমানা পেরিয়ে উর্ধজগতের অসংখ্য গ্রহ–নক্ষত্রের মধ্য থেকে কোন একটিও কখনো অন্যের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না এবং কোনটি কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ ৩৪ টীকা, আর রা'দ ২ টীকা, আল হিজর ৮ ও ১২ টীকা, আল মু'মিনুন ১৫ টীকা, লুকমান ১৩ টীকা, ইয়াসীন ৩৭ টীকা, আস্ সাফ্ফাত ৫ ও ৬ টীকা, আল মু'মিন ৯০ টীকা এবং কাফ ৭ ও ৮ টীকা)।

১০. এখানে সূর্যের কথা বলা হয়েছে। মূলে وَهَّاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে অতি উত্তপ্ত আবার অতি উজ্জ্বলও। তাই আয়াতের অনুবাদে আমি দু'টো অর্থই ব্যবহার করেছি। এ ছোট বাক্যটির মধ্যে মহান আল্লাহর শক্তি ও কর্মকুশলতার যে বিরাট নিদর্শনটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সে নিদর্শনটির অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বেশী এবং তার আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার আলোর শক্তি এত বেশী যে, মানুষ খালি চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার উত্তাপ এত বেশী যে, পৃথিবীর কোথাও তার উত্তাপের ফলে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌছে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিকুশলতার মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী তার বর্তমান অবস্থানের চাইতে সূর্যের বেশী কাছাকাছি নয় বলে অস্বাভাবিক গরম নয়। আবার বেশী দূরে নয় বলে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডাও নয়। এ কারণে এখানে মানুষ, পশু–পাখি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ সম্ভবপর হয়েছে। সূর্য থেকে শক্তির অপরিমেয় ভাণ্ডার উৎসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ শক্তিই পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন ধারণের উৎস। তারি সাহায্যে আমাদের ক্ষেতে ফসল পাকছে। এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তার আহার লাভ করছে। তারি উত্তাপে সাগরের

পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, তারপর বাতাসের সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বারি বর্ষণ করে। এ সূর্যের বুকে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন যা কোটি কোটি বছর থেকে সমগ্র সৌরজগতে আলো, উত্তাপ ও বিভিন্ন প্রকার রশ্মি অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে চলছে।

১১. পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভিদের তরতাজা হয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুশলতার যে বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ ঘটে চলছে সে সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ সূরা আন নাহল ৫৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১৭ টীকা, আশ্ শূ'আরা ৫ টীকা, আর রুম ৩৫ টীকা, ফাতের ১৯ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ২০ টীকা, আয যুখ্রফ ১০-১১ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ২৮ থেকে ৩০ টীকা।

এ আয়াতগুলোতে একের পর এক বহু প্রাকৃতিক নিদর্শন ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা চোখ মেলে একবার পৃথিবীর চারদিকে তাকাও, পাহাড়-পর্বত, তোমাদের নিজেদের জন্ম, নিদ্রা, জাগরণ এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের এই ব্যবস্থাপনাটি গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো; বিশ্ব-জাহানে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, আকাশ রাজ্যে প্রদীপ্ত সূর্য, মেঘপুঞ্জ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারা এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন তরুলতা ও বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, তাহলে এসবের মধ্যে তোমরা দু'টি জিনিস সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এক, একটি জবরদস্ত শক্তির সহায়তা ছাড়া এসব কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না এবং এ ধরনের নিয়ম-শৃংখলার আওতাধীনে জারীও থাকতে পারে না। দুই, এসব জিনিসের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি বিরাট হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন একটি কাজও হচ্ছে না। যে মহাশক্তি এসব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করতে পারে, এদেরকে ধ্বংস করে দেবার এবং ধ্বংস করার পর আবার নতুন করে অন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করার তার ক্ষমতা নেই, এ ধরনের কথা এখন কেবলমাত্র একজন মূর্খই বলতে পারে। আর একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে যে, যে জ্ঞানময় সত্তা এই বিশ্ব-জাহানের কোন একটি কাজও বিনা উদ্দেশ্যে করেননি, তিনি নিজের এ জগতে মানুষকে জেনে বুঝে ভালো ও মন্দের পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতার স্বাধীনতা এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টিকে কাজে লাগাবার ও ইচ্ছা মতো ব্যবহার করার ক্ষমতা বিনা উদ্দেশ্যেই দান করেছেন। একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে। মানুষ তার সৃষ্ট এ জিনিসগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করুক বা খারাপভাবে উভয় অবস্থার পরিণাম সমান হবে, একজন ভালো কাজ করতে করতে মারা যাবে, সে মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, আর একজন খারাপ কাজ করতে করতে মারা যাবে সেও মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, যে ভালো কাজ করবে সে তার ভালো কাজের কোন প্রতিদান পাবে না এবং যে খারাপ কাজ করবে সে ও তার খারাপ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে না এবং কোন প্রতিফল পাবে না, এ ধরনের কথা একজন জ্ঞানহীন মানুষই বিশ্বাস করতে পারে। মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কিত এসব যুক্তিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আর রা'আদ ৭ টীকা, আল হজ্জ ৯ টীকা, আর রুম ৬ টীকা, সাবা ১০ ও ১২ টীকা এবং আস্ সাফ্ফাত ৮ ও ৯ টীকা।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

আসলে জাহান্নাম একটি ফাঁদ।[১৪] বিদ্রোহীদের আবাস। সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে।[১৫] সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষতঝরা ছাড়া কোন রকম ঠাণ্ডা এবং পানযোগ্য কোন জিনিসের স্বাদই পাবে না।[১৬] (তাদের কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল। তারা কোন হিসেব-নিকেশের আশা করতো না। আমার আয়াতগুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[১৭] অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।[১৮] এখন মজা বুঝ, আমি তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া কোন জিনিসে আর কিছুই বাড়াবো না।

১২. এখানে শিংগার শেষ ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এর আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই সমস্ত মরা মানুষ অকস্মাৎ জেগে উঠবে। "তোমরা বলতে শুধুমাত্র যাদেরকে তখন সম্বোধন করা হয়েছিল তাদের কথা বলা হয়নি বরং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো লোক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে তাদের সবার কথা বলা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৫৭ টীকা, আল হাজ্জ ১ টীকা, ইয়াসীন ৪৬ ও ৪৭ টীকা এবং আয্ যুমার ৭৯ টীকা)।

১৩. এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও একই সাথে কিয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, প্রথম আয়াতটিতে শেষ দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী দু'টি আয়াতে দ্বিতীয় দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল হাক্কার ১০ টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। "আকাশ খুলে দেয়া হবে" এর মানে হচ্ছে উর্ধজগতে কোন বাধা ও বন্ধন থাকবে না। সব দিক থেকে সব রকমের আসমানী বালা ও মুসিবতের এমন বন্যা নেমে আসতে থাকবে যেন মনে হবে তাদের আসার জন্য সমস্ত দরজা খুলে গেছে এবং তাদের বাধা দেবার জন্য কোন একটি দরজাও বন্ধ নেই। আর পাহাড়ের চলার ও মরীচিকায় পরিণত হবার মানে হচ্ছে, দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। তারপর ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, যেখানে একটু আগে বিশাল পর্বত ছিল সেখানে দেখা যাবে বিশাল বালুর সমুদ্র। এ অবস্থাকে সূরা ত্বাহায় নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়

কোথায় চলে যাবে? এদের বলে দাও, আমার রব তাদেরকে ধূলোয় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে কোথাও একটুও অসমতল ও উঁচুনীচু জায়গা এবং সমান্যতম ভাঁজও দেখতে পাবে না।" (১০৫–১০৭ আয়াত এবং ৮৩ টীকা)।

১৪. শিকার ধরার উপযোগী করে যে জায়গাটিকে গোপনে তৈরী করা হয় এবং নিজের অজ্ঞাতসারে শিকার যেখানে চলে এসে তার মধ্যে আটকে যায়, তাকেই বলে ফাঁদ। জাহান্নামের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে তারা জাহান্নামের ভয়ে ভীত না হয়ে দুনিয়ায় এ মনে করে লাফালাফি দাপাদাপি করে ফিরছে যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাদের জন্য একটি ঢালাও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানে তাদের পাকড়াও হবার কোন আশংকা নেই। কিন্তু জাহান্নাম তাদের জন্য এমন একটি গোপন ফাঁদ যেখানে তারা আকস্মিকভাবে আটকা পড়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হবার আর কোন উপায় থাকে না।

১৫. মূলে আহকাব (أَحْقَابِ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময়। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হবার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। এ থেকে লোকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, জান্নাতের জীবন হবে চিরন্তন কিন্তু জাহান্নাম চিরন্তন হবে না। কারণ এ যুগ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, এখানে যখন যুগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তখন এ থেকে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সময় অশেষ ও অফুরন্ত হবে না। বরং একদিন না একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দু'টি কারণে এই যুক্তি ভুল। এক, আরবীতে 'হাকব' শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যেই এ ভাবধারা রয়েছে যে, একটি হাকবের পিছনে আর একটি হাকব রয়েছে। কাজেই আহকাব অপরিহার্যভাবে এমন যুগের জন্য বলা হবে যা একের পর এক আসতেই থাকবে এবং এমন কোন যুগ হবে না যার পর আর কোন যুগ আসবে না। দুই, কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআন মজীদের কোন আয়াত থেকে এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে ঠিক নয়, যা সেই একই বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। কুরআনের ৩৪ জায়গায় জাহান্নামবাসীদের জন্য 'খুলুদ' (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিন জায়গায় কেবল "খুলুদ" বলেই শেষ করা হয়নি বরং তার সাথে "আবাদান" "আবাদান" (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, "তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখ্খনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।" (আল মায়েদাহ ৩৭ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন তারা এ অবস্থায় চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।" জান্নাতবাসীদের সম্পর্কেও এ একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।" (হুদ ১০৭–১০৮ আয়াত) এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর 'আহকাব' শব্দের ভিত্তিতে একথা বলার অবকাশ আর কতটুকু থাকে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীরা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে না বরং কখনো না কখনো তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে?

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

২ রুকূ’

অবশ্যি মুত্তাকীদের[১৯] জন্য সাফল্যের একটি স্থান রয়েছে। বাগ–বাগিচা, আঙুর, নবযৌবনা সমবয়সী তরুণীবৃন্দ[২০] এবং উচ্ছসিত পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন বাজে ও মিথ্যা কথা।[২১]

১৬. মূলে গাস্‌সাক (غَسَّاق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় ঃ পুঁজ, রক্ত, পুঁজ মেশানো রক্ত এবং চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের কঠোর দৈহিক নির্যাতনের ফলে যেসব রস বের হয়। এছাড়াও এ শব্দটি ভীষণ দুর্গন্ধ ও পঁচে গিয়ে উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এমন জিনিসের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৭. এ হচ্ছে তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব ভোগ করার কারণ। প্রথমত, দুনিয়ায় তারা এ মনে করে জীবন যাপন করতে থাকে যে, আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের আসনের হিসেব পেশ করার সময় কখনো আসবে না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ নিজের নবীদের মাধ্যমে তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব আয়াত পাঠিয়েছিলেন সেগুলো মেনে নিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।

১৮. অর্থাৎ তাদের সমস্ত কথা ও কাজ, তাদের সব রকমের উঠাবসা–চলাফেরা এমনকি তাদের চিন্তা, মনোভাব, সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আমি তৈরি করে রাখছিলাম। সেই রেকর্ড থেকে কোন কিছুই বাদ যেতে পারেনি। অথচ সেই নির্বোধদের এ সবের কোন খবর ছিল না। তারা নিজেদের জায়গায় বসে মনে করছিল, তারা কোন মগের মুল্লুকে বাস করছে, নিজেদের ইচ্ছে মতো তারা এখানে যাচ্ছেতাই করে যাবে এবং তাদের এসব স্বেচ্ছাচারের জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৯. এখানে মুত্তাকী শব্দটি এমন সব লোকের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের দুনিয়ার কার্যক্রমের হিসেব দেবার কোন ধারণা পোষণ করতো না। এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই নিশ্চিতভাবেই এ আয়াতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল এবং একথা মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছিল যে, কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ায় সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

২০. এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে । আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে যেসব পুরুষের স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে তারা সে সব স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। ইতিপূর্বে সূরা সা'দ–এর ৫২ আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ৩৭ আয়াতেও এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا
لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّآ أَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার[২২] তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক, যার সামনে কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না।[২৩]

যেদিন রূহ[২৪] ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।[২৫] সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের দিকে ফেরার পথ ধরুক।

যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।[২৬] যেদিন মানুষ সেসব কিছুই দেখবে যা তার দু'টি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।[২৭]

২১. জান্নাতে মানুষ কোন বাজে, নোংরা, মিথ্যা ও অর্থহীন কথা শুনবে না। মানুষের কান এ থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকে জান্নাতের বিরাট নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জান্নাতে কোন কটূকথা ও আজেবাজে গপসপ হবে না। কেউ কারোর সাথে মিথ্যা কথা বলবে না এবং কারোর কথাকে মিথ্যাও বলবে না। দুনিয়ায় গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, অভিযোগ, কুৎসা প্রচার ও অন্যের ওপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা মানুষের সমাজে চলছে তার ছিঁটে ফোটাও সেখানে থাকবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ১৩ ও ১৪ টীকা।)

২২. প্রতিদান শব্দের পরে আবার যথেষ্ট পুরস্কার দেবার কথা বলার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে যে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে কেবলমাত্র ততটুকুই তাদেরকে দেয়া হবে না বরং তার ওপর অতিরিক্ত পুরস্কার এবং অনেক বেশী পুরস্কার দেয়া হবে। বিপরীত পক্ষে জাহান্নামবাসীদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ

অপরাধ তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না এবং কমও দেয়া হবে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুস ২৬–২৭ আয়াত, আন নাম্‌ল ৮৯–৯০ আয়াত, আল কাসাস ৮৪ আয়াত, সাবা ৩৩ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

২৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের শান–শওকত, প্রভাব ও প্রতিপত্তি এমন পর্যায়ের হবে যার ফলে পৃথিবী বা আকাশের আধিবাসী কারোর আল্লাহর সামনে কথা বলার অথবা তাঁর আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার সাহস হবে না।

২৪. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে জিব্রীল আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর দরবারে তিনি উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার কারণে এখানে অন্যান্য ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে তাঁর কথা বলা হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল মা'আরিজ ৩ টীকা)

২৫. এখানে কথা বলা মানে শাফায়াত করা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র দু'টি শর্ত সাপেক্ষে সেদিন এ শাফায়াত সম্ভব হবে। এক, যে ব্যক্তিকে যে গুনাহগারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র সে–ই তার জন্য শাফায়াত করতে পারবে। দুই, শাফায়াতকারীকে সঠিক ও যথার্থ সত্য কথা বলতে হবে। অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না। দুনিয়ায় কমপক্ষে সত্যের কালেমার সমর্থক অর্থাৎ নিছক গুনাহগার ছিল, কাফের ছিল না, এমন ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করতে হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ ২৮১ টীকা, ইউনুস ৫ টীকা, হূদ ১০৬ টীকা, মারয়াম ৫২ টীকা, ত্বা–হা ৮৫–৮৬ টীকা, আল আম্বিয়া ২৭ টীকা, সাবা ৪০–৪১ টীকা, আল মু'মিন ৩২ টীকা, আয যুখ্‌রুফ ৬৮ টীকা, আন নাজম ২১ টীকা এবং আল মুদ্‌দাস্‌সির ৩৬ টীকা)

২৬. আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি এখানে একথা চিন্তা করতে পারে যে যাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছিল তারা চৌদ্দ'শ বছর আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছে এবং এখনো বলা যেতে পারে না, কিয়ামত আগামী কত শত, হাজার বা লক্ষ বছর পরে আসবে, তাহলে একথাটি কোন্ অর্থে বলা হয়েছে যে, যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম? তাছাড়া সূরার সূচনায় কেমন করে একথা বলা হলো যে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে? এর জবাব এই যে, মানুষ যতক্ষণ এ দুনিয়ার স্থান ও কালের সীমানায় রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে অবস্থান করে কেবল ততক্ষণই তার মধ্যে সময়ের অনুভূতি থাকে। মরণের পরে যখন শুধুমাত্র রূহই বাকি থেকে যাবে তখন আর সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে না। আর কিয়ামতের দিন মানুষ যখন পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে তখন তার মনে হবে যেন এখনি ঘুমের মধ্যে কেউ তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার বছর পরে তাকে আবার জীবিত করা হয়েছে, এ অনুভূতির লেশমাত্রও তখন তার মধ্যে থাকবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ২৬ টীকা, বনি ইসরাঈল ৫৬ টীকা, ত্বা–হা ৮০ টীকা এবং ইয়াসীন ৪৮ টীকা)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় জন্মই না হতো অথবা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতাম এবং আবার জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ না হতো।